দ্য ম্যান হু কাউন্টেড

এক গাণিতিক অভিযাত্রার কাহিনি

মূল: মালবা তাহান

অনুবাদ: আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

মালবা তাহান কে?

দ্য আলকেমিস্টের লেখক পাওলো কোয়েলহো তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “অ্যা গ্রেট স্টোরিটেলার।“

মালবা তাহান আসলে ব্রাজিলিয়ান লেখক হুলিও সিজার দা মেইয়ো এ সুজার ছদ্মনাম। হুলিও সিজার এই নামটি ব্যবহার করেই তাঁর অসাধারণ লেখাগুলোর বেশিরভাগ লিখেছেন।

…

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু

০১। মেধার মিলন

০২। যার ওপর আস্থা রাখা যায়

বিষয়বস্তু

বাগদাদ। খলিফা হারুন অর রশিদের সময়কাল।

০১

মেধার মিলন

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

আমার নাম হানাক তাদে মাইয়া। একবার বাগদাদের রাস্তা ধরে উটের পিঠে করে বাড়ি ফিরছিলাম ধীরগতিতে। এতদিন টাইগ্রিস নদীর তীরের সামারা শহর ঘুরে বেড়িয়েছি। হঠাৎ দেখালাম, ভদ্র পোশাকের একজন মুসাফির একটি পাথরের ওপর বসা। ভ্রমণের ক্লান্তির ছাপ চোখে-মুখে।

স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তাকে সালাম দিতে যাচ্ছিলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে তিনি মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, “চৌদ্দ লক্ষ তেইশ হাজার সাত শ পয়তাল্লিশ।“ এরপর দ্রুত করে বসে পড়ে নিরব হয়ে গেলেন। দুই হাতের ওপর মাথা রেখে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন। থেমে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলাম। তাকে মনে হচ্ছিল অতীতের রূপকথার গল্প থেকে উঠে ঐতিহাসিক কোনো ব্যক্তির ভাস্কর্য।

একটু পর আবার দাঁড়ালেন। পরিষ্কার ভাষায় সযত্নে আরেকটি বিশাল সংখ্যা আওড়ালেন, “তেইশ লক্ষ একুশ হাজার আট শ ছেষট্টি।“

আরও কয়েকবার দাঁড়িয়ে লোকটা এমন কিছু সংখ্যা উচ্চারণ করলেন। আবারও রাস্তার পাশের রুক্ষ পথরটার উপর বসলেন তিনি। কৌতূহল দমন করতে না পেরে আমি তার কাছে গেলাম। সালাম দিয়ে সংখ্যাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

“হে আগন্তুক,” গণনাকারী বললেন, “আমার চিন্তা-ভাবনা ও হিসাবের অসুবিধা হলেও আপানার কৌতূহলকে এড়িয়ে যাব না। আপনি আমার সাথে সৌজন্য ও ভদ্রতার সাথে কথা বলেছেন। আপনার ইচ্ছা পূরণ করছি। তবে আগে আপনাকে আমার নিজের কাহিনি বলতে হয়।“

এরপর তিনি আমাকে নিজের কাহিনি শোনালেন। মজার গল্পটা আমি তাঁর কণ্ঠেই শোনাচ্ছি আপনাদের।

০২

যার ওপর আস্থা রাখা যায়

**এ অধ্যায়ে**

গণনাকারী তাঁর জীবনের গল্প শোনাচ্ছেন। জানলাম তাঁর হিসাব করার বিস্ময়কর ক্ষমতার কথা। জানতে পারবেন কীভাবে আমরা একে অপরের সফরসঙ্গী হলাম।

আমার নাম বেরেমিজ সামির। পারস্যের খোই গ্রামে আমার জন্ম। পিরামিডের মতো দেখতে সুউচ্চ আরারাত পর্বতের ছায়ায় গ্রামটির অবস্থান। খুব ছোট থাকতেই আমি রাখালের কাজ শুরু করি। আমার মনিব ছিলেন খামাত অঞ্চলের একজন বিত্তশালী মানুষ।

“প্রতিদিন ভোরের আলো ফুটলেই আমি বিশাল এক ভেড়ার পাল নিয়ে তৃণভূমিতে চলে যেতাম। আলো ফুরাবার আগেই আমাকে ফিরে আসতে হত। কোনো ভেড়া হারিয়ে গেলে কঠোর শাস্তির ভয় ছিল। এ ভয়ে আমি প্রতিদিন কয়েকবার সেগুলো গুণতাম।

“গণনায় আমি খুব দক্ষ হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে তো এক নজর দেখেই পুরো পাল গুণে ফেলতে পারতাম। গণনার চর্চার জন্যে আমি আকাশে ওড়া পাখির ঝাঁক গুণতাম। ক্রমেই এই শিল্পে আমি কুশলী হয়ে উঠতে থাকলাম। আমি পিঁপড়া ও অন্যান্য পোকামাকড় গুণতে থাকলাম। কয়েক মাস পরে দারুণ এক অর্জন হয়ে গেল আমার। একটি মৌছাকের সব মৌমাছি গুণে ফেললাম আমি। এই কৃতিত্ব অবশ্য আমার পরের অর্জনগুলোর তুলনায় কিছুই নয়।

“কিছুটা দূরের অঞ্চলে আমার সহৃদয় মনিবের কিছু মরুদ্যান ছিল। যেখানে ছিল সুবিশাল খেজুর বৃক্ষসারি। আমার গাণিতিক প্রতিভার কথা মনিব জেনেছিলেন। এবার তিনি আমাকে খেজুর বিক্রির দায়িত্ব দিলেন। সেগুলোকে গুচ্ছে গুচ্ছে একটি একটি করে গুণতাম আমি। এভাবে খেজুর গাছের তলায় আমার দশ বছর কাটল। মনিবের প্রচুর লাভ হলো। খুশি হয়ে তিনি আমাকে চার মাসের অবকাশ দিলেন। এখন আমি বাগদাদ যাচ্ছি। সেখান আমার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করব। আর দেখব সেখানকার সুন্দর সুন্দর মসজিদ ও জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদগুলো।

“সময় নষ্টের হাত থেকে বাঁচতে আমি ভ্রমণ করতে করতে এই অঞ্চলের খেজুর গাছগুলো গুণেছি। গুণেছি সেই ফুলগুলো যেগুলোর ঘ্রাণে এই পথ বিমোহিত হয়ে আছে। সে পাখিগুলো যেগুলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পাখা মেলে উড়ছে। “

কাছের একটি ডুমুর গাছ দেখিয়ে তিনি বললেন, “এই যেমন এই গাছটির কথাই ধরুন। এতে দুই শ চুরাশিটি ডাল আছে। প্রতি ডালে গড়ে তিন শ সাতচল্লিশটি পাতা থাকলে, সহজেই হিসাব করা যায়, এতে মোট আটানব্বই হাজার পাঁচ শ আটচল্লিশটি পাতা আছে। তাই না, বন্ধু?”

“অসাধারণ!” আমার কণ্ঠে বিস্ময়। “এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য যে একজন মানুষ একটি গাছের দিকে এক নজর তাকিয়ে সবগুলো ডালের সংখ্যা বলতে পারে। বাগানের সব ফুলের সংখ্যা বলতে পারে। এই প্রতিভা কাজে লাগিয়ে যে কেউই অনেক টাকার মালিক হতে পারে।“

“আপনার কি তাই মনে হয়?” বেরেমিজ বললেন। “আমার কখনও মনে হয়নি, লক্ষ পাতা ও মৌমাছি গুণে অর্থ পাওয়া যেতে পারে। একটি গাছে কয়টি ডাল আছে তা কার কী কাজে লাগবে? আকাশের একটি পাখির ঝাঁকে কয়টি খেচর উড়ছে তাই বা কে টাকা দিয়ে জানতে চাইবে?”

“আপনার বিস্ময়কর প্রতিভা,” আমি ব্যাখ্যা করলাম, “কুড়িটা আলাদা উপায়ে কাজে লাগানো সম্ভব। কনস্টান্টিনোপাল বা এমনকি বাগদাদের মতো বিশাল রাজধানীতে আপনি সরকারকে অপরিসীম সহায়তা করতে পারেন। আপনি মানুষ, সেনাবাহিনি ও পশুর পাল গুণতে পারবেন। দেশের সম্পদের হিসাব করা আপনার জন্যে সহজ। দেশের উৎপাদন, কর, পণ্য ও দেশের সব অর্থের হিসাব-নিকাশ আপনি করে ফেলতে পারবেন। আমার বাড়ি বাগদাদে। সে সুবাদে আমি আমার পরিচিতি কাজে লাগিয়ে আমি আমাদের শাসক ও মনিব খলিফা আল-মুতাসিমের দরবারে আপনার জন্যে কোনো পদের ব্যবস্থা করে ফেলার আস্থা দিতে পারি। আপনি কোষাধ্যক্ষ হতে পারেন। অথবা মুসলমানদের পারিবারিক বিষয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।“

“ঠিক আছে, আমি তাহলে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম।“ বললেন গণনাকারী। “আমি বাগদাদেই যাচ্ছি।“

আর কথা না বাড়িয়ে তিনি আমার পেছনে উটে উঠে বসলেন। একমাত্র উটের পিটে চেপে আমরা অপূর্ব সুন্দর বাগদাদ শহরের দিকে এগিয়ে চলছি। গাঁয়ের পথে হঠাৎ সাক্ষাৎ ঘটা সেই লোক সেই থেকে হয়ে গেলেন আমার বন্ধু ও সর্বক্ষণের সঙ্গী।

বেরেমিজ খুব হাসিখুশী মানুষ। কথা বলেন খুব। বয়সটা বেশি নয় (তখনও ছাব্বিশ পূর্ণ হয়নি)। তিনি ছিলেন প্রানোচ্ছ্বল বুদ্ধিমত্তার আশির্বাদপুষ্ট। ছিল সংখ্যার বৈশিষ্ট্য জানার ছিল দুর্বার নেশা। খুব সাদামাটা ঘটনা থেকেও তিনি অন্যদের জন্যে অসম্ভব তুলনা বের করে আনেন। যা তাঁর গাণিতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তিনি গল্প ও কাহিনি বলতেও পারদর্শী। সেজন্যে তাঁর কথাবার্তা শুনতে অদ্ভুত হলেও আকর্ষণীয়।

কখনও কখনও তিনি কয়েক ঘণ্টা চুপ হয়ে বসে থাকতেন। একটুও শব্দ করতেন না। মনে মনে কিন্তু চলছে কড়া হিসাব-নিকাশ। এ সময়গুলোতে আমার কষ্ট হলেও তাকে বিরক্ত করতাম না। তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিতাম। হয়ত ঐ সময়েই এই মেধাবী মনন থেকে বেরিয়ে আসবে গণিতের প্রাচীন কোনো রহস্যের অপূর্ব আবিষ্কার। যে বিজ্ঞানকে আরবরা উন্নত করেছে ও তাতে নতুন অবদান যোগ করেছে।

০৩

বোঝাবাহী পশু

**এ অধ্যায়ে**

৩৫টি উট বন্টনের কাহিনি, যেগুলোকে তিন আরব ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। যেভাবে গণনাকারী বেরেমিজ সামির আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব সেই ভাগটি করলেন, যার ফলে তর্করত তিন ভাই সন্তুষ্ট হয়ে গেল। যেভাবে এর ফলে আমাদেরও লাভ হলো।

একটানা কয়েক ঘণ্টা চললাম আমরা। হঠাৎ করে বলার মতো একটা ঘটনা ঘটল। আমার সহযাত্রী বেরেমিজ এবার দক্ষ বীজগাণিতিকের মতো তাঁর মেধার প্রতিফলন দেখালেন।

একটি পুরনো ও অর্ধ-পরিত্যক্ত সরাইখানার কাছে তিনজন মানুষকে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করতে দেখলাম। পাশেই কতগুলো উট দাঁড়িয়ে আছে। রাগে তিনজনের মুখ লাল হয়ে আছে। শোনা গেল তাদের কথা:

“না, তা হতে পারে না।“

“এ তো ডাকাতি!”

“কিন্তু আমি তো রাজি নই তাতে!”

বুদ্ধিমান বেরেমিজ তাদেরকে তর্কের কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

“আমরা তিনজন সহোদর।“ বড়জন বলল। “উত্তরাধিকার সূত্র ৩৫টি উট পেয়েছি আমরা। বাবার ইচ্ছা অনুসারে এগুলোর অর্ধেক পাব আমি। তিন ভাগের এক ভাগ পাবে আমার ভাই হামিদ। আর নয় ভাগের এক ভাগ পাবে ছোট ভাই হারিম। কিন্তু আমরা ভাগটা করতে পারছি না। কেউ কিছু বললেই বাকি দুজন প্রতিবাদ করে। এ পর্যন্ত যত সমধান এসেছে তার কোনোটাই গ্রহণযোগ্য হয়নি। ৩৫-এর অর্ধেক ১৭.৫। তিন ভাগ বা নয় ভাগের একভাগও তো ভাল কোনো সংখ্যা নয়। তাহলে কীভাবে ভাগ হবে?”

“খুব সোজা,” বললেন গণনাকারী। “আমি সঠিকভাবে ভাগ করে দিচ্ছি। তোমাদের ৩৫টি উটের সাথে আমার সুদর্শন উটটিও যোগ করলাম।“

কিন্তু আমি বাধ সাধলাম, “এমন পাগলামি আমি মানি না। উট ছাড়া আমরা সফর করব কীভাবে?”

“চিন্তা করো না, বাগদাদের বন্ধু,” বেরেমিজ কানে কানে বলল, “আমি যা করছি জেনে-বুঝেই করছি। তোমার উটটা দাও। দেখোই না কী করি।“

তাঁর কথার আত্মবিশ্বাসের স্ফুরণ দেখে আমি আর দ্বিধা না করে আমার সুন্দর উটটি তাঁকে দিয়ে দিলাম। এবার একে তিন ভাইয়ের উটের সাথে যোগ করা হলো।

“বন্ধুগণ,” তিনি বললেন, “আমি একটি ন্যায় বণ্টন ও সঠিক বিভাজন করব। এখন আমাদের কাছে উট আছে ৩৬টি।“

বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “আপনার উট পাওয়ার কথা ৩৫-এর অর্ধেকসংখ্যক। মানে ১৭.৫। আমি আপনাকে দেব ১৮টি। এতে আপনার আপত্তি করার কিছুই নেই, কারণ আপনি প্রাপ্যের চেয়ে বেশিই পাচ্ছেন। “

দ্বিতীয় ভাইকে তিনি বললেন, “হামিদ, আপনার পাওয়ার কথা ৩৫-এর তিন ভাগের এক ভাগ। মানে ১১টির ভগাংশ পরিমাণ বেশি। এখন আপনি পাবেন ১২টি। আপনার কিছু বলার কথা নয়, আক্রণ আপনি বেশিই পেয়েছেন।“

এবার তিনি ছোটভাইয়ের দিকে ঘুরলেন, “হারিম নামির, আপনার বাবার ইচ্ছা অনুসারে আপনি পাচ্ছেন ৩৫-এর নয় ভাগের এক ভাগ, যাতে ৩টা ও আরেকটার কিছু অংশ হয়। কিন্তু আমি পুরো ৪টি উট দিলাম। আপনিও প্রাপ্যের চেয়ে বেশিই পেয়েছেন বলে আমাকে ধন্যবাদ দিতে পারেন।“

এবার তিনি বলে গেলেন, “আমার বণ্টনে সবাই লাভবান হয়েছেন। বড় ভাই পেছেন ১৮টি উট, পরের ভাই পেয়েছেন ১২টি, আর ছোটভাই ৪টি। ১৮ + ১২ + ৪ = ৩৪টি উট বণ্টন হয়েছে। ২টি উট বাকি থাকল। এর একটি আমাদের বাগদাদী বন্ধুর উট। আমি সমস্যাটি সমাধান করে দিয়েছি বলে আরেকটি উট আমাকে দিতে পারেন চাইলে।“

“হে আগন্তুক, আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান একজন মানুষ।“ বড় ভাইর কণ্ঠে প্রশংসা। “আমরা বিশ্বাস করি, সঠিক ও ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনই হয়েছে। আমরা আপনার সমাধান গ্রহণ করলাম।“

বুদ্ধিমান গণনাকারী বেরেমিজ পাল থেকে ভাল একটু উট নিলেন। আমার উটের লাগাম তুলে দিলেন আমার হাতে। বললেন, “বন্ধু, চলো, আরাম ও তৃপ্তির সাথে যাত্রা শুরু করি। এখন আমার কাছেও উট আছে।“

আমরা বাগদাদের উদ্দেশ্যে চলতে লাগলাম।

০৪

চিন্তার জন্যে খাবার

**এ অধ্যায়ে**

এক ধনী শেখের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল। আমাদের আট টুকরো রুটি সম্পর্কে সে যে প্রস্তাব দিল। আমাদের পাওয়া আটটি মুদ্রার বণ্টন যে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হলো। বেরেমিজের তিন ধরনের ভাগ পদ্ধতি: সরল, প্রকৃত ও নিখুঁত বিভাজন। গণনাকারীর প্রতি মহান উজিরের প্রশংসা।

তিন দিন পরের কথা। আমরা সিপ্পুর নামে ছোট একটি ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাছাকাছি হলাম। দেখলাম, হাত-পা মাটিয়ে ছড়িয়ে একজন উসাফির বসা। জামা-কাপড় ছেঁড়া-ফাটা। গায়ে ভাল আঘাতও আছে। অবস্থা খুব নাজুক। হতভাগ্য মানুষটার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলাম আমরা। তিনি পরে আমাদেরকে তার দূর্ভাগ্যের গল্প শোনালেন।

তার নাম সালিম নাসাইর। বাগদাদের অন্যতম বিত্তশালী বণিক। কয়েক দিন আগে বসরা থেকে আল-হিল্লাহ যাওয়ার পথে পারসিক মরু ডাকাত তার কাফেলাকে হামলা ও লুট করে। প্রায় সবাই তাদের হাতে মারা পড়েছে। তিনি ছিলেন কাফেলার নেতা। বালুর মধ্যে অন্যান্য লাশের মধ্যে লুকিয়ে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান।

দুঃখের কাহিনি শেষ করে কাঁপাকাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনাদের কাছে কি খাওয়ার কিছু হবে? আমি খিদেয় মরে যাচ্ছি।“

“আমার কাছে রুটির তিনটে টুকরো আছে।“ আমি উত্তর দিলাম।

“আমার কাছে আছে পাঁছটা।“ বলেন গণনাকারী।

“খুব ভাল,” বললেন শেখ। “আমাকে একটু দেওয়া যাবে কি? আমি এর প্রতিদান দেব আপনাদেরকে। বাগদাদে পৌঁছলে আমি রুটির বদলে আট টুকরো স্বর্ণ দেব।“

আমরা তাই করলাম।

পরের দিন পড়ন্ত বিকেলে আমরা প্রাচ্যের মুক্তো, বিখ্যাত বাগদাদ শহরে প্রবেশ করলাম। কর্মব্যস্ত চত্বর পার হতেই সুন্দর পোশাকের একদল মানুষ আমাদের সামনে পড়ল। অভিজাত পিঙ্গল বর্ণের এক ঘোড়ায় চেপে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অন্যতম ক্ষমতাশালী উজির ইব্রাহিম মালুফ। আমাদের সাথে শেখ সালিম নাসাইরকে দেখে তিনি বহর থামালেন। শেখকে বললেন, “কী হয়েছে তোমার, বন্ধু?” কেন তুমি ছিন্ন পোশাকে দুই আগন্তুকের সাথে বাগদাদে এসেছ?”

হতভাগা শেখ ভ্রমণের আদ্যোপান্ত তুলে ধরলেন। আমাদের প্রশংসা করলেন পঞ্চমুখে।

“এখনই এদের দাম দিয়ে দাও, “উজির নির্দেশ দিলেন। পকেট থেকে আটটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে সালিম নাসাইরকে দিলেন। তাকে বললেন, “আমি এক্ষুণি তোমাকে দরবারে নিয়ে যাব। বিশ্বাসীদের রক্ষক নতুন এই মরু ডাকাতদের কথা অবশ্যই জানতে চাইবেন, যারা খলিফা এলাকার ভেতরেই আমাদের বন্ধুদের আক্রমণ করে মালামাল লুটে নেয়।“

এরপর সালিম নাসাইর বললেন, “বন্ধুগণ, তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি তাহলে। তোমাদের সাহায্যের জন্যে আবারও ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি অনুসারে তোমাদের মূল্য দিতে চাই।“

গণনাকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই নাও তোমার পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা, পাঁচ টুকরো রুটির জন্য।“

“আর হে বাগদাদের বন্ধু, এই নাও তোমার তিনটি স্বর্ণমুদ্রা।“ বললেন আমাকে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে গণনাকারী সশ্রদ্ধ আপত্তি জানালেন। “মাফ করবেন, শেখ, এই বণ্টনকে দেখে সরল মনে হলেও গাণিতিকভাবে ভুল। আমি পাঁচ টুকরো রুটি দিয়েছে হিসেবে সাতটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া উচিত। আমার বন্ধু, যে তিনটি টুকরো দিয়েছে, তার পাওয়া উচিত একটি স্বর্ণমুদ্রা।“

“বলো কী!” উজিরও আকাশ থেকে পড়লেন। কৌতূহলভরে প্রশ্ন করলেন, “এমন অদ্ভুত ভাগের পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে?”

গণনাকারী মন্ত্রীর কাছাকাছি হলেন। বললেন:

“জি, আমি দেখাচ্ছি। আমার কথা গাণিতিকভাবে সঠিক। সফরের সময় আমাদের খিদা লাগলে আমি এক টুকরো রুটি নিলাম। একে তিন ভাগ করে সবাই এক ভাগ করে খেলাম। এভাবে আমার পাঁচটি টুকরো পনের খণ্ড হলো, ঠিক? আমার বন্ধুর তিন টুকরো হলো নয় খণ্ড। মোট খণ্ড হলো চব্বিশটি। আমার পনের খণ্ড থেকে আমি খেয়েছি আট খণ্ড। ফলে আমি আসলে দান করেছি সাত খণ্ড। আমার বন্ধুও খেয়েছে আট খণ্ড। আর দান করেছে নয় খণ্ড। ফলে সে আসলে দান করেছে এক খণ্ড। আমার দান করা সাত খণ্ড আর আমার বন্ধুর এক খণ্ড নিয়ে মোট আট খন্ড খেলেন শেখ। অতএব ন্যায়সঙ্গত বণ্টন এটাই যে আমি পাব সাতটি মুদ্রা আর আমার বন্ধু পাবে একটি মুদ্রা।“

উজির গণনাকারীর ভীষণ প্রশংসা করলেন। তাঁর হিসাব অনুসারেই মুদ্রাগুলো ভাগ করে দিতে আদেশ দিলেন। গণিতবিদের প্রমাণটি ছিল যুক্তিসঙ্গত, নিখুঁত ও অকাট্য।

তবে এই বণ্টন যতই ন্যায়ানুগ হোক, বেরেমিজের নিজের তা পছন্দ হয়নি। উজিরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “এই ভাগ, যেখানে আমি সাতটি মুদ্রা পাচ্ছি আর আমার বন্ধু একটি পাচ্ছে, এটা গাণিতিকভাবে সঠিক হলেও আল্লাহর কাছে এটি সুন্দর নয়।“

মুদ্রাগুলো একত্র করে তিনি সমান দুই ভাগ করলেন। এক ভাগ নিজে রেখে আরেক ভাগ আমাকে দিয়ে দিলেন।

“ইনি এক অসাধারণ মানুষ।” বললেন উজির। তিনি আট কয়েনের বণ্টন মেনে নেননি। প্রমাণ করলেন তিনি পাবেন সাতটি আর তার বন্ধু পাবেন একটি। পরে কী করলেন? সমান দুই ভাগ করেও বন্ধুকেও সমান অংশ দিলেন।“

“এই যুবকটি শুধু জ্ঞানী আর দক্ষ গণিতবিদই না, একজন উদারচিত্তের বন্ধুও বটে। আজ থেকেই তাঁকে আমার সচিব নিয়োগ করলাম।“

“সম্মানিত উজির,” বললেন গণনাকারী, “দেখলাম, আপনি ৫৬ অক্ষরে আমার শোনা সবচেয়ে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তোমার মঙ্গল ও হেফাজত করুন।“

আমার বন্ধুর দক্ষতার কারিশমা শব্দ ও অক্ষর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এমন ঈর্ষণীয় মেধায় আমরা সবাই চমকপ্রদ হলাম।

০৫

কথায় এত শব্দ

**এ অধ্যায়ে**

সোনালী হংসী নিবাসে যাওয়ার পথে বেরেমিজ সামির যেসব অসাধারণ হিসাব-নিকাশ করেছেন। আমাদের পুরো ভ্রমণে যতগুলো শব্দ ও গড়ে মিনিটে যত শব্দ ব্যবহার করেছেন। কীভাবে তিনি একটি সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

শেখ নাসাইর ও উজির মালুফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সোনালী হংসী নামে একটি মুসাফিরখানায় উঠলাম। এটা সুলাইমান মসজিদের পাশেই অবস্থিত। সেখানে কাছের পরিচিত এক উটচালকের কাছে আমাদের উটগুলো বিক্রি করলাম।

পথিমধ্যে আমি বেরেমিজকে বললাম, “দেখেছো বন্ধু, আমি বলেছি না, তোমার মতো এমন গুণতে ওস্তাদ মেধাবী বাগদাদে সহজেই চাকরি পেয়ে যাবে। তুমি আসতে না আসতেই তারা তোমাকে উজিরের সচিবের পদ গ্রহণ করতে প্রস্তাব দিল। এখন আর তোমাকে খোই গ্রামের বিষণ্ণ ও পাথুরে জায়গায় ফিরে যেতে হবে না।

গণনাকারী বললেন, “এখানে হয়ত আমি উন্নতি করতে পারব। ধনী হব। কিন্তু আবার একদিন পারস্য ফিরে গিয়ে আমি আমার স্বদেশকে দেখতে চাই। সে তো এক অকৃতজ্ঞ যে এক মরুদ্দ্যানে উন্নতি ও সুবিধা পেয়ে গিয়ে নিজের দেশ ও শৈশবের বন্ধুদের ভুলে যায়।“

আমার বাহুতে হাত রেখে তিনি বললেন, “আমরা ঠিক একদিন একসঙ্গে চলেছি। এই সময়ে বিভিন্ন জিনিস ব্যাখ্যা ও আলাপ-আলোচনা করতে গিয়ে আমি ঠিক ৪,১৪,৭২০ টি শব্দ উচ্চারণ করেছি। আট দিনে ১১,৫২০ মিনিট হয়। অতএব, সহজেই হিসাব করা যায়, এই ভ্রমণের সময় আমি গড়ে প্রতি মিনিটে ৩৬টি শব্দ বলেছি। মানে ঘণ্টায় ২,১৬০ শব্দ। সংখ্যাগুলো বলছে, আমি কম কথা বলেছি। আমি কথা বলেছি সতর্কতার সাথে। অর্থহীন আলাপ করে তোমার সময় নষ্ট করিনি। অল্প কথার ও অনেক বেশি নিরব মানুষ অনাকর্ষণীয় প্রাণীতে পরিণত হন। আবার যারা অনর্গল কথা বলে যেতেই থাকে তারা সঙ্গীকে বিরক্ত করে ফেলেন। অতএব, অর্থহীন আলাপ পরিহার করা উচিত। আবার মুখ বন্ধ করে রেখে সোজন্যহীনও হওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে তোমাকে একটি ঘটনা বলব।“

একটু দম নিয়ে গণনামানব শুরু করলেন:

“পারস্যের তেহরানে এক বৃদ্ধ বণিকের তিন ছেলে ছিল। একদিন বণিক তাদেরকে ডেকে বললেন, ‘যে অর্থহীন কথা না বলে সারাদিক কাটাতে পারবে পুরস্কার হিসেবে ২৩টি স্বর্ণমুদ্রা দেব।‘

“রাতের বেলা তিন ছেলেই বৃদ্ধ বাবার শিয়রে হাজির হলো। বড় ছেলে বলল, ‘বাবা, আমি সব ধরনের অর্থহীন বাক্যালাপ থেকে বিরত থেকেছি। আমার আশা, আমিই সেজন্যে প্রতিশ্রুত পুরস্কারটি পাব। আপনার নিশ্চয় মনে আছে ২৩টি স্বর্ণমুদ্রা দেবেন বলেছিলেন।‘

“দ্বিতীয় ছেলেও আসল। বাবার হাত চুম্বন করে বলল, ‘শুভ সন্ধ্যা, বাবা।’

“সর্বকনিষ্ঠ ছেলে কোনো কথাই বলল না। বাবার কাছে এসে হাত প্রসারিত করে পুরস্কার তুলে দেওয়ার ইঙ্গিত করল। বণিক তিন ছেলেরই আচরণ দেখলেন। বললেন, ‘বড় ছেলে আমার কাছে এসে নানান ধরনের অর্থহীন কতা বলে আমার মনযোগ হারিয়ে ফেলল। ছোট ছেলে অতিমাত্রায় অল্পভাষী। অতএব, পুরস্কার পাবে দ্বিতীয় ছেলে। সে সতর্কতার সাথে কথা বলেছে। বাগাড়ম্বর করেনি। সরল আচরণ করেছে। দম্ভ দেখায়নি।‘ ”

গল্প শেষ করে বেরেমিজ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি মনে হয় বৃদ্ধ লোকটি ছেলের সাথে সঠিক আচরণ করেছে?”

আমি জবাব দিলাম না। ভাবলাম, এই বিস্ময়কর মানুষটার সাথে ২৩টি মুদ্রা নিয়ে আলাপ না করাই ভাল। তিনি তো সবসময় সবকিছুকে সংখ্যায় পরিণত করেন। গড় বের করেন। সমস্যা সমাধান করেন।

একটু পর আমরা সোনালী হংসীতে পৌঁছলাম। মুসাফিরখানার পরিচালকের নাম সালিম। একসময় বাবার হয়ে কাজ করতেন। আমাকে দেখে হাসলেন, আবার কাঁদলেন, “খোকা, আল্লাহ তোমার সহায় হোন। এখন ও সবসময় তোমার ইচ্ছা পূরণে আমি প্রস্তুত।“

তাকে বললাম, আমার ও আমার গণনাকারী বন্ধু উজিরের সচিব বেরেমিজ সামিরের জন্যে কক্ষ প্রয়োজন।

সালিম জিজ্ঞেস করল, “ইনি একজন গণিতবিদ? তাহলে আমাকে একটি কঠিন সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে একদম ঠিক সময়েই এসেছেন তিনি। এক স্বর্ণকারের সাথে এইমাত্র আমার তর্ক হলো। অনেক তর্কের পরেও আমরা সমস্যাটির সমাধান করতে পারিনি।”

মুসাফিরখানায় মহান এক গণিতবিদের আগমন ঘটেছে শুনে বেশ কিছু কৌতূহলী মানুষের সমাগম হয়েছে। স্বর্ণকারকে ডেকে আনা হলো। সেও সমস্যার সমাধানে দারুণ ইচ্ছুক।

“সমস্যাটা কী?” জিজ্ঞাসা বেরেমিজের।

“এই লোকটা,” স্বর্ণকারকে দেখিয়ে বৃদ্ধ সালিম বললেন, “সিরিয়া থেকে বাগদাদ এসেছে দামী রত্নপাথর নিয়ে। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার সব রত্ন ১০০ দিনারে বিক্রি করতে পারলে থাকার খরচ হিসেবে ২০ দিনার দেবে আমাকে। আর ২০০ দিনারে বিক্রি করতে পারলে ৩৫ দিনার দেবে। কয়েকদিনের চেষ্টার পরে সে সবগুলো রত্ন ১৪০ দিনারে বিক্রি করেছে। এখন আমাকে কত দেওয়া উচিত?”

“২৪.৫ দিনার! এটাই সঠিক হিসাব। ” সিরিয়ানের জবাব। “২০০ দিনারে বিক্রি করলে যদি ৩৫ দিনার দেওয়া লাগে, তাহলে তার দশ ভাগের এক ভাগ প্রতি ২০ দিনারের জন্য আমাকে দিতে হবে ৩.৫ দিনার। এখন, তোমরা জানো, আমি রত্ন বিক্রি করে ১৪০ দিনার পেয়েছি, যা আমার হিসাব মতে ২০ এর ৭ গুণ। অতএব, রত্নগুলো ২০ দিনারে বিক্রি করলে ৩.৫ দিনার ভাড়া দিতে হলে ১৪০ দিনারে বিক্রি করলে ভাড়া হবে ৭ গুণ ৩.৫। মানে ২৪.৫ দিনার।“

২০০: ৩৫ :: ১৪০:ক

ক =

“তুমি ভুল বলেছো,” বৃদ্ধ সালিম রেগে বললেন। “আমার হিসাব মতে আমি ২৮ দিনার পাব। শোনো! ১০০ দিনারে বিক্রি হলে আমি পেতাম ২০ দিনার। ১৪০ দিনারের জন্যে তাহলে পাব ২৮ দিনার। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।

“১০০ দিনারের জন্যে ২০ দিনার পেলে এর দশ ভাগের এক ভাগ ১০ দিনারের জন্যে পাব ২ দিনার করে। ১৪০ হলো ১০-এর ১৪ গুণ। তাহলের ১৪০ দিনারের জন্য পাব ১৪ গুণ ২ দিনার। মানে ২৮ দিনার।

১০০: ২০:: ১৪০: ক

“অতএব, আমাকে ২৮ দিনার দিতে হবে।“ বৃদ্ধ সালিমের কণ্ঠে উত্তেজনা।

“শান্ত হও তোমরা,” গণনাকারী বললেন। “মাথা ঠাণ্ডা রেখে হিসাব করতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে রাগ আর ভুল হয়। তোমাদের দুজনের হিসাবই ভুল। আমি দেখাচ্ছি।“

“কথা ছিল, ১০০ দিনারে রত্ন বিক্রি হলে হলে ভাড়া হবে ২০ দিনার আর ২০০ দিনারে বিক্রি হলে ৩৫ দিনার। মানে এ রকম:

|  |  |
| --- | --- |
| বিক্রয় মূল্য | ভাড়া |
| ২০০ | ৩৫ |
| -১০০ | -২০ |
| ১০০ | ১৫ |

“দেখতেই পাচ্ছো, বিক্রয়মূল্যে ১০০ দিনারের পার্থক্য হলে ভাড়ার পার্থক্য হয় ১৫ দিনার। বুঝতে পেরেছো?”

“একদম পরিষ্কারভাবে বুঝেছি।“ দুজনই বলল সমস্বরে।

“তাহলে,” গণিতবিদ বলে গেলেন, “বিক্রয়মূল্য ১০০ দিনার বাড়লে ভাড়ার পার্থক্য হয় ১৫ দিনার। তাহলে বিক্রয়মূল্য ৪০ টাকা বাড়লে ভাড়া কত বৃদ্ধি পাওয়া উচিত? ৪০ হলো ২০-এর দ্বিগুণ। ২০ হলো ১০০-এর ৫ ভাগের এক ভাগ। আবার ১৫ এর ৫ ভাগের এক ভাগ হলো ৩। তাহলে বিক্রয়মূল্য ২০ দিনার বাড়লে ভাড়া বাড়বে ৩ দিনার। তাহলে ৪০ দিনারের পার্থক্যের জন্যে ভাড়া বাড়বে ২০-এর দ্বিগুণ, মানে ৬ দিনার। অতএব, ১৪০ দিনারে রত্ন বিক্রি করায় ভাড়া হবে ২০ + ৬ = ২৬ দিনার।১

১০০: ১৫:: ৪০:ক

“বন্ধুগণ, সংখ্যাকে দেখতে সরল হলেও অনেক সময় সেরা জ্ঞানীকেও কুপোকাত করে দিতে পারে। যে ভাগকে দেখে মনে হয় নিখুঁত তাও হতে পারে পারে ভুলে ভরা। হিসাবের অনিশ্চয়তা থেকেই আসে গণিতবিদের সম্মান। চুক্তি অনুসারে মুসাফিরখানাকে ২৬ দিনার দিতে হবে, ২৪.৫ নয়। “

“ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন,“ স্বর্ণকার মেনে নিলেন। “আমি বুঝতে পেরেছি, আমার হিসাব ছিল ভুল।“

তিনি বৃদ্ধ সালিমকে ২৬ দিনার বের করে দিলেন। আর একটি রত্নপাথরের আংটি তুলে দিলেন বেরেমিজের হাতেও। প্রকাশ করলেন কৃতজ্ঞতা। জড় হওয়া মানুষগুলো গণনাকারীর প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ পথ ধরল।

অনুবাদকের নোট

১। এটা আমরা আরেকভাবে বের করতে পারি। ১৪০ দিনারে কত ভাড়া হবে সেটা বের করতে হলে ১০০ এবং ২০০ দুই বিক্রয়মূল্যই মাথায় রাখা লাগবে। এখন দুটোর গড় করে ফেললে কেমন হয়? ৩৫ এবং ২০ এর গড় ২৬.৫। কিন্তু বিক্রয়মূল্য ১৪০ তো ১০০ এবং ২০০ থেকে সমান দূরে নয়। কিন্তু গড় করে ফেললে তো দুটো সংখ্যা সমান গুরুত্ব পায়। অতএব কোন সংখ্যাকে কতটুকু গুরত্ব দেব তা ঠিক করতে হবে। ১০০ এবং ২০০ এর ব্যবধানকে ১০ ভাগ করি। ১৪০-এর আগে থাকে ৪ ভাগ আর পরে থাকে ৬ ভাগ। ১৪০ যেহেতু ১০০ এর বেশি কাছে, তাই ১০০কে (মানে ভাড়া ২০কে) বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাহলে ২০-এর গুরুত্ব (পরিসংখ্যানের ভাষায় weight) হবে ৬, আর ৩৫ এর গুরুত্ব ৪। আর ওয়েট থাকা অবস্থায় গড় করতে ভাগ দিতে হবে মোট ওয়েট দিয়ে। তাহ্লে

০৬

সংখ্যা দিয়ে পরীক্ষা

**এ অধ্যায়ে**

উজির মালুফের সাথে সাক্ষাতের সময় আমাদের সাথে যা ঘটেছিল। আমাদের সাথে একজন কবির দেখা হয়, হিসাব-নিকাশের প্রতি যার আস্থা ছিল না। গণনাকারী এখানে বড় একটি কাফেলার উট গণনা করার একটি মৌলিক পদ্ধতি দেখিয়েছেন। পাত্রীর বয়স ও উটের কানের সংখ্যার মধ্যে মিল স্থাপন করেছেন। বেরেমিজ দ্বিঘাত বন্ধুত্ব ও বাদশা সুলাইমান (আ:) সম্পর্কে জেনেছেন।

দ্বিতীয় নামাজের পরে আমরা তাড়াতাড়ি করে উজির ইব্রাহিম মালুফের বাসায় গেলাম। এখানে এসে দারুণ বিস্ময়াভিভূত হলাম। ভারী লোহার গেট পার হয়ে আমরা একটি সংকীর্ণ করিডোরে পা রাখলাম। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একজন কৃষাঙ্গ দাস। কাঁধে সোনার বাহুবন্ধনী। প্রাসাদের ভেতরের বাগানে প্রবেশ করলাম আমরা। অপরূপ সুন্দর বাগানটিতে দুই সারি কমলা গাছ ছায়া বিলিয়ে দিচ্ছে। এখান থেকে বিভিন্ন দিকে অনেকগুলো দরজা চলে গেছে। কোনো কোনোটা নিশ্চয় হেরেমের দিকে গেছে।

দুজন দাস ফুল তুলছিল। আমাদেরকে দেখে সরে গিয়ে পিলারের আড়ালে দাঁড়াল। উঁচু দেয়ালের ভেতর দিয়ে সরু একটি পথ দিয়ে আমরা একটি উঠোনে এসে পৌঁছলাম। উঠোনের ঠিক মধ্যখানে চমৎকার একটি ঝর্ণা। তিনটি ফোয়ারা পানি ছিটাচ্ছে। তিনটি তরল রেখা সূর্যের আলোতে চিকচিক করছে।

দাসকে অনুসরণ করে আমরা উঠোন পার হয়ে খোদ প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। সামনে পড়ল অনেকগুলো সুশোভিত কক্ষ। রূপার প্রলেপযুক্ত রং-বেরংয়ের দামী কাপড় ঝোলানো দেয়ালে। শেষ পর্যন্ত উজিরের সাথে দেখা হলো। বিশাল কুশনে বসে দুই বন্ধুর সাথে আলাপ করছিলেন তিনি।

একজনকে চিনলাম। শেখ সালেম নাসির। আমাদের মরু অভিযানের সহযাত্রী। আরেকজন ছোটখাট গোলগাল চেহারার মানুষ। চেহারায় দয়া ফুটে আছে। দাড়িতে হালকা পাক ধরেছে। জামা-কাপড় কেতাদুরস্ত। গলায় একটা চারকোণা পদক ঝুলছে। পদকের অর্ধেকটা দেখতে সোনালী হলুদ। বাকিটা ব্রোঞ্জের মতো কালো।

উজির মালুফ আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। পদকধারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “হে প্রিয় কবি, ইনি হচ্ছে আমাদের মহান গণনাকারী। তাঁর সাথের তরুণ মানুষটি বাগদাদের বাসিন্দা। আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ার পর আকস্মিকভাবে তার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ।“

সম্মানিত শেখকে আমরা ভক্তিভরে সালাম দিলাম। পরে আমরা জেনেছি, তাঁর সঙ্গী মানুষটি ছিলেন বিখ্যাত কবি আব্দুল হাজমিদ। যিনি খলিফা আল-মুতাসিমেরও কাছে বন্ধু। গলার পদকটি তিনি পেয়েছেন খলিফার কাছ থেকেই। কাফ, লাম ও আইন অক্ষর তিনটি ছাড়াই ৩০, ২০০ পঙতির কবিতা লেখার পুরস্কার এটি।

কবে হেসে হেসে বললেন, “বন্ধু মালুফ, এই পারস্যদেশীয় গণনাকারীর অপূর্ব ক্ষমতা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে।“ সংখ্যাকে মিশ্রিত করলে একটি চালাকি তৈরি হয়। যাকে বলা যায় বীজগাণিতিক চতুরতা। একবার মোদাদের পুত্র রাজা এল-হারিতের কাছে এক বিজ্ঞ মানুষ আসেন। তিনি নাকি বালু দেখে ভাগ্য বলতে পারেন। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি নিখুঁত হিসাব করতে পারো?’ বিস্ময়ের আবেশ কাটার আগেই তিনি বললেন, ‘নিখুঁত হিসাব করতে না পারলে আপনার সবগুলো পরিকল্পনা অর্থহীন; আপনি যদি নিছক হিসাবের মাধ্যমে সেগুলো করেন তবে সেগুলো আমি অবিশ্বাস করি।‘ ভারতে একটি প্রবাদ শিখেছি, ‘হিসাবকে সাতবার অবিশ্বাস করুন, আরে গণিতবিদকে এক শ বার।‘ “

উজির বললেন, “অবিশ্বাস দূর করার জন্যে আমাদের অতিথিকে চূড়ান্তভাবে একবার পরীক্ষা করা যাক।“ এটা বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বেরেমিজের বাহু ধরে প্রাসাদের একদিকের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। জানালা খুলে আরেকটি উঠোনের দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন। সেখানে অনেকগুলো উটের সারি। সবগুলো ভাল জাতের। দেখলাম, দুটো কি তিনটে মঙ্গোলীয় সাদা উট। বাকিগুলো পশমহীন চামড়ার ক্যারেহ।

উজির বললেন, “দারুণ এই উটগুলো আমি গতকাল কিনেছি। আমি এগুলোকে উপহার হিসেবে আমার পুত্রবধুর বাড়িতে পাঠাতে চাই। আমি জানি এখানে ঠিক কতগুলো উট আছে। তুমি কি বলতে পারবে কতগুলো আছে?”

পরীক্ষাকে আরও কঠিন করতে উজির সাহেব উটগুলোর দিকে মুখ করে শিস দিলেন। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এখানে অনেক অনেক উট। তাও আবার ছোটাছুটি করছে এদিক-সেদিক। আমার বন্ধু ভুল করলেই আমাদের ভ্রমণের আনন্দ ছাই হয়ে যাবে।

কিন্তু ঘুরে বেড়ানো উটের পালের দিকে চোখ বুলিয়ে আমার বন্ধু বেরেমিজ বললেন, “সম্মানিত উজির, আমার হিসাব বলছে, এখানে উট আছে ২৫৭টি।“

“একদম সঠিক!”উজির জানিয়ে দিলেন। “আল্লাহর কসম, দুইশন সাতান্নটিই উট আছে।“

“আপনি এত দ্রুত কীভাবে বললেন, তাও নিখুঁত করে?” কবির চোখে-মুখে এক সাগর কৌতূহল।

“খুব সহজ,“ বললেন বেরেমিজ। “একটা একটা করে উট গণনায় কোনো মজা নেই। তাই আমি প্রথমে খুরগুলো গুণলাম। পরে কানগুলো। মোট পেলাম ১৫৪১। সাথে যোগ করলাম ১। একে ৬ দিয়ে ভাগ করলাম। নিঃশেষে ভাগ হয়ে ২৫৭ হলো।“

“অসাধারণ,” উজির কণ্ঠে প্রশংসা। “কত মৌলিক চিন্তা! কে ভেবেছিল, নিছক মজা পাওয়ার জন্যে কেউ কান ও খুর গুণবে?”

“আমি বলব, “ বেরেমিজ বললেন, “মাঝেমাঝে গণনাকারীর উদাসীনতা বা অক্ষমতা হিসাবকে কঠিন করে তোলে। একবারের ঘটনা। আমি তখন খোই শহরে ছিলাম। আমি মনিবের পশুর পাল দেখছিলাম। এসময় এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ে গেল। একজন রাখাল জিজ্ঞেস করল আমি সেগুলো গুণতে পারব কি না। ‘আট শ ছাপ্পান্ন,’ বললাম আমি। রাখাল বলল, ‘কী! আট শ ছাপ্পান্ন? এত বেশি?’ তখন আমি বুঝলাম, আমি প্রজাপতির বদলে গুণেছি পাখার সংখ্যা। দুই দিয়ে ভাগ দিতেই সঠিক সংখ্যা পেলাম।

শুনে উজির খুব মজা পেলেন। সঙ্গীতের মতো মিষ্টি সুরে হেসে উঠলেন।

“সবকিছুই বুঝলাম,” কবি বলছেন। “উটের সঠিক সংখ্যা পেতে চার খুর ও দুই কানের জন্য ৬ দিয়ে ভাগ দিতে হবে বুঝলাম। কিন্তু ১৫৪১ কে ৬ দিয়ে ভাগ দেওয়ার আগে ১ যোগ করতে হলো কেন?”

“খুব সহজ,” জবাব দিলেন বেরেমিজ। “কান গুণতে গিয়ে দেখলাম, একটি উটের একটি কান নেই। সে কারণেই ১ যোগ করে নিয়েছি।“

এবার বেরেমিজ উজিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বেয়াদবি মাফ করলে জিজ্ঞেস করতাম, আপনার পুত্রবধুর বয়স কত?”

“না, না, অসুবিধা নেই।“ উজির বললেন, “আস্তিরের বয়স ষোলো।“ এবার তিনি সংশয় নিয়ে জানতে চাইলেন, “কিন্তু ওর বয়সের সাথে তো আমি যে উটগুলো উপহার পাঠাব সেগুলোর সাথে কোনো সম্পর্ক দেখছি না।“

“আমি শুধু ছোট একটি পরামর্শ দিতে চাই।“ বললেন বেরেমিজ। ত্রুটিযুক্ত উটটি পাল থেকে সরিয়ে নিলে উট থাকবে ২৫৬টি। যা ১৬-এর বর্গ। ১৬ গুণ ১৬ সমান ২৫৬। আস্তিরের বাবাকে পাঠানো উপহার তাহলে গাণিতিকভাবে নান্দনিক হবে। ২৫৬ কে ২-এর ঘাত আকারে প্রকাশ করা যায় (২৮)। আর ২৫৭ হলো মৌলিক সংখ্যা। বর্গ সংখ্যার সাথে ভালাবাসা বেশি মিলে যায়। বর্গ সংখ্যা নিয়ে মজার একটি গল্প প্রচলিত আছে। চাইলে শোনাতে পারি।“

“আনন্দের সাথেই শুনব,” বললেন উজির। “সুন্দর গল্প সুন্দর করে বললে শুনতেও সুন্দর লাগে। আমার শোনার কৌতূহল হচ্ছে।“

সৌজন্য প্রকাশ করে গণনাকারী শুরু করলেন, “বাদশা সুলাইমান (আ:) সম্পর্কে বলা হয়, সৌজন্য ও জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তিনি তাঁর বাগতত্তা, সুন্দরী রানি বিলকিসকে ৫২৯ টি মুক্তার একটি বাক্স উপহার দেন। ৫২৯ কেন? কারণ ৫২৯ হলো ২৩-এর বর্গ। মানে ২৩ গুণ ২৩ সমান ৫২৯। আর ২৩ ছিল রানির বয়স। তরুণী আস্তিরের বয়স ১৬। তাই ২৫৬ টি উট দেওয়া সুন্দর দেখায়।“

সবাই গণনাকারীর দিকে তাকাল বিস্ময় নিয়ে। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, “১৬-এর বর্গ ২৫৬, যার অঙ্কগুলো যোগ করলে পাওয়া যায় ১৩। ১৩-এর বর্গ ১৬৯। ১৬৯-এর অঙ্কগুলোর যোগফল আবার ১৬। ফলে ১৩ ও ১৬ সংখ্যা দুটির মধ্যে দারুণ একটি সম্পর্ক আছে। একে আমরা বলতে পারি দ্বিঘাত সম্পর্ক। সংখ্যাদের বাকশক্তি থাকলে আমরা হয়ত তাদের আলাপ শুনতাম: ১৬ ১৩কে বলছে, ‘আমি তোমার প্রতি আমাদের বন্ধুত্বের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই। আমার বর্গ ২৫৬, যার অঙ্কগুলোর যোগফল ১৩।‘ ১৩ উত্তরে বলছে, ‘তোমার সৌজন্যের জন্যে ধন্যবাদ, প্রিয় বন্ধু। আমিও তোমাকে উপহার দিতে চাই। আমার বর্গ ১৬৯, যার অঙ্কগুলোর যোগফল ১৬। ‘

“আমার মনে হয় ২৫৬’র পক্ষে আমি যথেষ্ট কারণ উল্লেখ করেছি। ২৫৭’র চেয়ে সংখ্যাটি অনেক অনেক সুন্দর। “

“তোমার বুদ্ধিটা খুব অনন্য,” উজির উত্তর দিলেন। “হ্যাঁ, এটাই করব আমি, যদিও মানুষ বলবে আমি সুলাইমানকে (আ) নকল করেছি। কবির দিকে ঘুরে উজির বললেন, “দেখছি এই মানুষটি গল্প যেমন বলতে পারেন, তেমনি বুদ্ধিমত্ত্বার সাথে তুলনাও টানতে পারেন। তাকে সচিব বানিয়ে তো ভালই করেছি।“

“সম্মানিতে উজির, আমি দুঃখিত,” বেরেমিজ বললেন, “আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারি এক শর্তে। আমার বেকার ও নিঃস্ব বন্ধু হানাক তাদে মাইয়ারও একটি চাকরি প্রয়োজন। “

গণনাকারীর উদারতা দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তিনি এভাবে আমাকে উজিরের সামনে তুলে ধরবেন তা আমি ভাবতেও পারিনি।“

“আপনি উত্তম অনুরোধ করেছেন।“ উজির জানালেন। “আপনার বন্ধুকে নথিলেখকের দায়িত্ব দিচ্ছি। সাথে থাকবে যথাযোগ্য বেতন।“

উজির ও মহানুভব বেরেমিজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি সাথে সাথে সম্মত হয়ে গেলাম।

০৭

চার চারের কারিশমা

আমাদের প্রথমবার বাজারের যাওয়ার গল্প। বেরেমিজ ও নীল পাগড়ির কাহিনি। চারটি চারের ঘটনা। পঞ্চাশ দিনারের সমস্যা। সমস্যার সমধান করে বেরেমিজের সুন্দর উপহার পাওয়ার গল্প।

কয়েক দিন পরের ঘটনা। উজিরের অফিসের কাজ শেষ করে বাজার ও বাগদাদের বাগানে ঘুরতে বের হলাম। সেদিন বিকেলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কোলাহল ছিল। এর কারণ কয়েক ঘণ্টা আগেই দামেশক থেকে কিছু ধনী কাফেলা এসে পৌঁছেছে। কাফেলার আগমন ঘটলে সবসময় সবাই প্রাণোচ্ছ্বল হয়ে উঠত। অন্য দেশে কী জিনিস তৈরি হচ্ছে তা জানার এটাই একমাত্র উপায়। ভিনদেশী ব্যবসায়ীদের সাথেও মেশার সুযোগ আসে এর মাধ্যমে।

জুতার বাজারে তো প্রবেশ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কী খালি জায়গা, কী দোকান—সর্বত্র নতুন নতুন পণ্যের বস্তা ও বাক্সের ছড়াছড়ি। দামেশকের লোকেরা বড় বড় রংবেরংয়ের পাগড়ি ও কোমরে অনুশীলনের অস্ত্র নিয়ে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদাসীনভাবে দেখছে এ দোকান, সে দোকান। ধূপ, জর্দা ও মসলার তীব্র গন্ধ চারদিকে। সবজিবিক্রেতারা মারাত্মক রকম ঝগড়া করছে। অপমান করছে একে অন্যকে। মসুলের একজন তরুণ গিটারবাদক কিছু বস্তার উপর বসে বিমর্ষ ও একঘেয়ে সুরে গান গাইছে:

মানুষের জীবনের গুরুত্বই বা কী?

যদি মানুষ বেঁচে থাকে সম্ভাব্য সবচেয়ে সরলভাবে

সে ভাল বা খারাপ যাই হোক

আমার কথা এ পর্যন্তই

দোকানদাররা দোকানের সামনেও পণ্য সাজিয়ে রেখেছে। আরবদের উর্বর চিন্তাশক্তি কাজে লাগিয়ে নিজের অধিকার বেশি করে আদায় করছে।

“এই দেখুন, এই জামাটা একজন আমিরের গায়েই মানায়!”

“বন্ধুগণ, এই দারুণ সুগন্ধি আপনাকে স্ত্রীর কথা মনে করিয়ে দেবে।“

“হুজুর, এই চপ্পল ও এই কাফতান জুতাগুলো দেখুন। এগুলো জ্বিনেরা ফেরেশতাদেরকে উপহার দেয়।“

একটি রুচিশীল নীল পাগড়ি বেরেমিজের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কুঁজো এক সিরীয় লোক চার দিনারে সেটা বিক্রি করছিল। এই দোকানীর ঘরটাও ছিল একটু ব্যতিক্রমী। এখানের সবকিছু— পাগড়ি, বাক্স, খঞ্জর, চুড়ি ইত্যাদি—সবকিছুর দাম চার দিনার করে। উজ্জ্বল বর্ণে একটি ব্যানার লেখা।

এটা দেখে বেরেমিজ পাগড়িটা কিনতে আগ্রহী হলেন। বললাম, “এমন অপব্যয় পাগলামি ছাড়া কিছু না। আমাদের কাছে অল্প টাকা আছে। এখনও আমরা সরাইখানার ভাড়াও দেইনি।“

“আমার আকর্ষণ পাগড়ির দিকে নয়,” বেরেমিজ বললেন, “তুমি কি খেয়াল করেছো এই দোকানের নাম ‘চারটি চার?’ এই কাকতালীয় ঘটনার গুরুত্ব অস্বাভাবিক রকমের।”

“কাকতালীয় ঘটনা কেন?”

“এই দোকানের ক্যালকুলাসের একটি অসাধার বিষয়কে মনে করিয়ে দেয়। চারটি চার ব্যবহার করে আমরা যেকোনো সংখ্যায় পৌঁছতে পারি।“

বেরেমিজকে এর রহস্য জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা নরম বালুতে লিখে বোঝাতে শুরু করলেন।

“তুমি কি শূন্য চাও? এর চেয়ে সহজ কিছু হয় না। শুধু লিখো:

৪৪- ৪৪

“এখানে চারটি চার আছে, যার মান শূন্য।“

“তুমি কি এক পেতে চাও? সবচেয়ে সহজ উপায় হলো:

|  |
| --- |
| ৪৪ |
| ৪৪ |

“৪৪কে ৪৪ দিয়ে ভাগ দিলেই কেল্লা ফতে!”

“দুই বানাতে চাইলেও চারটি চার দিয়ে সহজেই লেখা যায়:

“দেখতেই পাচ্ছো, ভগ্নাংশ দুটির যোগফল ২।

“তিন তো আরও সোজা। শুধু এভাবে লিখতে হবে:

এখানে লবের যোগফল ১২, যাকে ৪ দিয়ে ভাগ দিলেই ৩ পাওয়া যায়।

“কিন্তু ৪ বানাবে কীভাবে?” আমার প্রশ্ন

“এর চেয়ে সহজ আর কিছু হয় নাকি?” বেরেমিজের উত্তর। “৪ তো অনেকভাবেই পাওয়া যায়। একটা দেখাচ্ছি:

দেখতেই পাচ্ছো, দ্বিতীয় পদের মান শূন্য। তারমানে রাশিটির মান ৪ + ০ = ৪।

দেখলাম, সিরীয় ব্যবসায়ী মনোযোগ দিয়ে বেরেমিজের কথা শুনছে। চার চারের সমাবেশ তাকে বেশ মুগ্ধ করেছে।

বেরেমিন বললেন, “পাঁচ বানাতে চাইলেও সমস্যা নেই।

“ছয় লিখব এভাবে:

“একটু ঘুরিয়ে লিখলেই পাব ৭:

“৮ বানানোও কোনো কঠিন কাজ নয়: ৪+৪-৪+৪

“৯ তো আরেক মজার সংখ্যা:

“এবার দেখাব দারুণ আরেক সংখ্যা:

“আমরা পেয়ে গেলাম ১০।“

কুঁজো দোকানী১ এতক্ষণ মনযোগ দিয়ে শুনছিল। এবার কথা বলে উঠল, “বুঝলাম, আপনি অনেক ভাল একজন গণিতবিদ। দুই বছর আগে আমি একটি গাণিতিক সমস্যায় পড়েছিলাম। সেটা সমাধান করে দিতে পারলে আপনি যে নীল পাগড়িটা কিনতে চাচ্ছেন তা আপনাকে উপহার দেব।“

এরপর দোকানদার সমস্যাটা বললেন।

“একবার মদিনার এক শেখ ও মিশরের কায়রোর এক লোককে ৫০ দিনার করে ধার দিয়েছিলাম। তিনি চার কিস্তিতে সেটা পরিশোধ করেন: ২০, ১৫, ১০, ৫। মানে এভাবে:

|  |  |
| --- | --- |
| পরিশোধিত অর্থ | বাকি থাকল |
| ২০ | ৩০ |
| ১৫ | ১৫ |
| ১০ | ৪ |
| ৫ | ০ |
| মোট ৫০ | মোট ৫০ |

“দেখুন পরিশোধিত অর্থ ও বাকি ঋণের যোগফল ৫০। আবার কায়রোর লোকটাও ৫০ দিনারই পরিশোধ করেছে। তবে কিস্তির পরিমাণ ছিল ভিন্ন:

|  |  |
| --- | --- |
| পরিশোধিত অর্থ | বাকি থাকল |
| ২০ | ৩০ |
| ১৮ | ১২ |
| ৩ | ৯ |
| ৯ | ০ |
| মোট ৫০ | মোট ৫১ |

“দেখুন প্রথম যোগলফটা ৫০। ঠিক আছে। কিন্তু অন্য যোগফলটি ৫১। এমন তো হওয়ার কথা নয়। এই কিস্তিগুলোর দ্বিতীয় অংশের যোগফলে বাড়তি ১ কোত্থেকে এল আমি বুঝতে পারছি না। জানি আমাকে ঠকানো হয়নি। আমি তো আমার পুরো ৫০ দিনারই পেয়েছি। কিন্তু ১ টাকার গড়বড় কীভাবে যে হলো?”

“বন্ধু,” বেরেমিজ শুরু করলেন, “অল্প শব্দেই এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাকি থাকা অর্থের সাথে মোট ঋণের কোনো সম্পর্ক নেই। ধরো ঋণ শোধ করা হয়েছে তিন কিস্তিতে: ১০, ৫ ও পরে ৩৫। তাহলে অবস্থাটা হবে এমন:

|  |  |
| --- | --- |
| পরিশোধিত অর্থ | বাকি থাকল |
| ১০ | ৪০ |
| ৫ | ৩৫ |
| ৩৫ | ০ |
| মোট ৫০ | মোট ৭৫ |

এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথম যোগফল ৫০। অন্য দিকে বাকি থাকা অর্থের যোগফল ৭৫। এটা আসলে যে কোনো সংখ্যাই হতে পারে। ৮০, ৯০, ১০০, ২৬০, বা ৮০০ ইত্যাদি যে কোনো সংখ্যা। ঘটনাগ্রমেই কোনো একবার ৫০ হয়ে যেতে পারে।“

দোকানী সন্তুষ্ট।২ তিনি প্রতিশ্রুতিটা রাখলেন। বেরেমিজকে ৪ দিনারের পাগড়িটা উপহার দিয়ে দিলেন।

অনুবাদকের নোট

১। ইন্টারনেটে Four Fours লিখে সার্চ দিলেই পরবর্তী সংখ্যাগুলো তৈরির দারুণ সব পদ্ধতি পাওয়া যাবে।

২। বাকি থাকা অর্থের যোগফল আসলে অর্থহীন একটা কাজ। দেখতে হবে বাকি থাকা ঋণের পরিমাণ শূন্য (০) হলো কি না। শূন্য হয়ে গেলেই বুঝতে হবে আর কোনো ঋণ বাকি নেই। ১ টাকা করে পরিশোধ করতে থাকলে তো বাকি ঋণের পরিমাণ হবে ৪৯, ৪৮, ৪৭, … ইত্যাদি। এগুলোকে যোগ করা অর্থহীন।

০৮

সপ্তম আকাশ

বেরেমিজের জ্যামিতিতে ডুব। শেখ সালিম নাসাইর ও তাঁর মেষপালক বন্ধুদের সাথে আলাপ। বেরেমিজের ২১টি পানপাত্রের সমস্যার সমধান। হারানো দিনারের সমাধান।

সিরীয় ব্যবসায়ী থেকে সুন্দর উপহার পেয়ে বেরেমিজ খুব খুশী। বললেন, “জিনিসটা খুব ভালোভাবে বানানো হয়েছে।“ সব দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন পাগড়িটা। “তবে একটা খুঁত আছে এতে, যা সহজেই এড়ানো যেত। এর আকৃতিটা জ্যামিতিকভাবে সঠিক নয়।“

তাঁর দিকে ঘুরে তাকালাম। বিস্ময় লুকোতে ব্যর্থ হলাম। মৌলিক চিন্তার অধিকারী লোকটা সবকিছুকেই জ্যামিতি দিয়ে চিন্তা করার উপায় বের করে ফেলত। এখন পাগড়িকেও জ্যামিতির চোখে দেখছে।

“বন্ধু, আমি জ্যামিতিক আকৃতি মেনে চলা পাগড়ি চাই বলে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই।“ বললেন পারস্যের পণ্ডিত। “সবকিছুতেই জ্যামিতি আছে। বিভিন্ন জিনিসের সাধারণ ও নিখুঁত আকৃতির দিকে তাকাও। ফুল, পাতা ও অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে যে প্রতিসাম্য দেখা যায় তার দিকে একবার তাকাও। আবারও বলছি, জ্যামিতি আছে সবখানে। আছে গোল সূর্যে, আছে পাতায়, রংধনুতে, প্রজাপতিতে, হীরায়, তারামাছ ও এমনকি ক্ষুদ্র বালুকণায়ও। প্রকৃতিতে অসীম রকম ভিন্ন ভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি আছে।

বাতাসে উড়ে চলা কাক এর দেহকে নিয়ে যায় দারুণ এক রেখা বরাবর। উটের শিরায় বয়ে চলা রক্তও কঠোর জ্যামিতিক নীতি মেনে চলে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এর অনন্য কুঁজ অসাধারণ এক উপবৃত্ত (ellipse)। শিয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারা পাথর বাতাসের সুন্দর এক রেখা ধরে চলে, যার নাম পরাবৃত্ত (parabola)। মৌমাছি বাসা বানায় ছয় কোণার প্রিজম দিয়ে দিয়ে। এই জ্যামিতিক আকৃতির মাধ্যমে সে সবচেয়ে পরিমিতভাবে উপাদান ব্যবহার করে।

জ্যামিতি আসলে সবখানে আছে। তবে সেটা দেখার জন্যে চোখ প্রয়োজন। বোঝার জন্যে বুদ্ধি প্রয়োজন। বিস্মিত হতে চাই সে রকম চেতনা। সাদাসিধে বেদুইনরা এসব জ্যামিতিক আকৃতি দেখে। কিন্তু বোঝে না। সুন্নিরা সেগুলো বোঝে, কিন্তু মূল্য দেয় না। তবে শিল্পীরা চিত্রগুলোর চমকারিত্ব ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করেন। শৃঙ্খলা ও ঐকতান দেখে বিমোহিত হন। আল্লাহ হলেন মহান জ্যামিতিক। তিনি বেহেশত ও দোজখকে জ্যামিতি দিয়ে গড়ে তুলেছেন। পারস্যে একটি গাছ আছে, যা উট ও ভেড়ার খাবার হিসেবে খুব জনপ্রিয়। এর বীজ…”

এভাবে তিনি একের পর একে জ্যামিতির সৌন্দর্য বর্ণনা করে গেলেন। বণিকদের জায়গা থেকে থেকে দীর্ঘ বালিময় রাস্তা ধরে যেতে যেতে বিজয়সেতুতে পৌঁছলেন তিনি। আমি মুগ্ধতার সাথে তাঁকে নীরবে অনুসরণ করলাম।

আমরা মুয়াজ্জিন চত্বর পার হলাম। জায়গাটার অপর নাম উটচালকদের আশ্রয়স্থল। সাত দুঃখ নামের সরাইখানা নিয়ে আলাপ করলাম আমরা। বেদুইন এবং দামেশক ও মসুলের মুসাফিররা গরম আবহাওয়া থেকে বাঁচতে হরহামেশা এতে আশ্রয় নেয়। এর সবচেয়ে রুচিশীল দিক ছিল ভেতরের উঠোনটা। গরমে এতে ভাল ছায়া পাওয়া যায়। এর চারদিকের দেয়াল লিবিয়ার পাহাড়ে জন্মানো সব ধরনের উদ্ভিদ দিয়ে আচ্ছাদিত। জায়গাটায় এলেই মন স্বস্তি ও শান্তিতে ভরে ওঠে।

কাঠের একটি পুরনো সাইনপোস্ট চোখে পড়ল, যার পাশে বেদুইনরা উট বেঁধে রাখে। পোস্টে লেখা:

সাত দুঃখ সরাইখানা

“সাত দুঃখ, “বেরেমিজ বিড়বিড় করলেন। “কী আশ্চর্য! তোমার কি কোনোভাবে এই সরাইখানার মালিককে চেন?”

“আমি তাকে ভালোভাবেই চিনি।“ উত্তর দিলাম। “সে ত্রিপলির একজন সাবেক দড়ি বেপারি। তার বাবা সুলতান কুরবানের অধীনে চাকরি করত। মানুষ তাকে ত্রিপলীয় বলে ডাকে। তার সরল ও অকপট মনের কারণে সবাই তাকে ভাল চোখে দেখে। ভাল এবং দয়ালু একজন মানুষ।